জরায়ুকথা
প্রজননপ্রযুক্তি কি নারীকে তার জরায়ু নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়?

আফিফা আফরিন

নারী পুরুষ অপেক্ষা ভিন্নতর, কেননা তার জরায়ু আছে। এই জরায়ু মানব সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। পিতৃতন্ত্র নারীর এই সক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীকে শৃঙ্খলিত করেছে, সমাজে দ্বিতীয় স্তরের অবস্থান দিয়েছে। পরিবার থেকে রাষ্ট্র সব পর্যায়েই নারীর সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাকে ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে বিভিন্ন নামে বিভিন্নভাবে; পারিবারিক অথবা সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় স্বার্থে। নারীর জরায়ুকে কেন্দ্র করে এই রাজনীতি থেকে মুক্ত হতে নারীবাদী তাত্ত্বিকরা এবং নারী আন্দোলনে সম্পৃক্তরা নারীর জরায়ুর ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে সামনে তুলে ধরেছেন। 'প্রজননপ্রযুক্তির ব্যবহার' নারীর পক্ষে এই রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ করতে সহায়ক হতে পারে বলে নারীবাদী তাত্ত্বিকরা, বিশেষত র‍্যাডিকেল নারীবাদীরা রায় দিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে লক্ষ করলে দেখা যাবে, নারী সন্তান নেবে কি না, নিলে কখন নেবে, কীভাবে নেবে, সন্তানসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রজননপ্রযুক্তির দ্বারস্থ হবে কি না, হলে কী ধরনের প্রজননপ্রযুক্তি ব্যবহার করবে— এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নারী নিজে নিতে পারছেন না, পরিবার বা সমাজ তার ওপর এসব সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে। আমার এই লেখাটি মূলত একটি বিশ্লেষণী প্রবন্ধ, যেখানে আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রজননপ্রযুক্তি নারীর জরায়ুর ওপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হচ্ছে কি না তার তাত্ত্বিক সমালোচনা করব। আমি দেখাতে চেষ্টা করব কীভাবে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ নারীর প্রজননপ্রযুক্তির ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং নারীর জরায়ুর ওপর তার নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নাকচ করে দিচ্ছে।

ভূমিকা

নারীর প্রজননক্ষমতা এমন একটি বিষয়, যা সৃষ্টির আদি থেকে বহুল আলোচিত। বাংলাদেশে প্রচলিত একটি প্রবাদ হলো 'নারীর পূর্ণতা মাতৃত্বে'। অর্থাৎ ভালো মা হতে না পারলে নারীর জীবনের কোনো সার্থকতা নেই। এই 'মানব সন্তান' জন্মদানের সক্ষমতার কারণেই নারীকে দেয়া হয়েছে দেবীত্বের মর্যাদা, অন্যদিকে সন্তান জন্মদানে (বিশেষ করে ছেলেসন্তান) ব্যর্থ হলে নারীর ভাগ্যে জুটেছে অবর্ণনীয় নির্যাতন। অর্থাৎ 'মাতৃত্ব'কে একই সাথে 'মহিমান্বিত' ও 'নারীর জন্ম সার্থক'কর বলা হলেও কিংবা নারীকে দেবী হিসেবে আরাধনার যোগ্য বলে বিশেষ মর্যাদা দিলেও প্রকৃতপক্ষে তা নারীর ওপর পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে। যে সমাজের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধগুলো 'মাতৃত্ব'কে মাপকাঠি ধরে নারীর জীবনের সার্থকতা বিচার করে, সেখানে নারীর যৌনতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত তা বলাই বাহুল্য।

অন্যদিকে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর দ্বিতীয় স্তরের অবস্থানের কারণে নারীর সন্তান নেয়া না নেয়া ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নারী নিজে নিতে পারছেন না; বরং সিদ্ধান্ত আসছে পরিবার থেকে। আবার বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এগুলোর প্রধান অভীষ্ট হলো নারী। সুতরাং নারীর প্রজননকে কেন্দ্র করে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের এক ধরনের অলিখিত রাজনীতি বিদ্যমান। এই অলিখিত রাজনীতি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য র‍্যাডিকেল নারীবাদীরা নারীর প্রজননক্ষমতাকে নারীর বঞ্চনার হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং নারীর কর্তৃত্ব স্থাপনে প্রজননপ্রযুক্তির দ্বারস্থ হয়ে সন্তান জন্মদান থেকে মুক্ত হতে বলেছেন।

১.

অনেক প্রাচীনকাল থেকেই নারী তার উর্বরতা (fertility) নিয়ন্ত্রণ করার তাগিদ অনুভব করছে [Throughout human history women have felt a need to regulate and control their fertility; (Fathalla, 1994)]। প্রথম দিকে এ তাগিদ ছিল নারীর প্রয়োজনে, পরে তা নিয়ন্ত্রণ করা হতো পুরুষতন্ত্রের (পরিবার/রাষ্ট্রের) স্বার্থে। র‍্যাডিকেল নারীবাদে প্রজননপ্রযুক্তি বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ লাভ করে। সর্বপ্রথম র‍্যাডিকেল নারীবাদীরাই, প্রজননপ্রযুক্তি যে নারীর কর্তৃত্ব/স্বাধীনতা আনতে পারে অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়। শুলামিথ ফায়ারস্টোন তাঁর The Dialectic of Sex (1971) গ্রন্থে দাবি করেন যে, নারীর বিধিবদ্ধ অধস্তনতা সেক্সের জৈবিক অক্ষমতার মধ্যে প্রোথিত।

নারীর প্রজননক্ষমতার ওপর তার নিজের নিয়ন্ত্রণ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে— এই আলোচনায় শুলামিথ ফায়ারস্টোন বলেন, 'প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ইতোমধ্যেই প্রজননক্ষমতার ওপর নারীর কর্তৃত্ব কিছু মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশ এক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে' (Fireston. S, 1971)।

র‍্যাডিকেল নারীবাদীরা অনেকেই নারীর জৈবিক মাতৃত্বের বিপক্ষে বলেন। 'মাতৃত্ব একটি কল্পকথা; যা তিন ধরনের বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল : ১. সকল নারীকেই মা হতে হবে, ২. সকল মায়েরই সন্তান প্রয়োজন ও ৩. সকল সন্তানেরই মা প্রয়োজন' (Oakley. A, 1974)। তিনি দাবি করেন, জৈবিক মাতৃত্ব নারীর অধিকারহীনতার মূল কারণ। তিনি বিশ্লেষণ করে বলেছেন, ছোটবেলা থেকেই কন্যাসন্তানকে বোঝানো হয় যে, মা হওয়াই তার জীবনের প্রধান কর্তব্য এবং এটাই সমাজস্বীকৃত। প্রকৃতপক্ষে এর মধ্য দিয়ে পুরুষের স্বার্থ রক্ষা হয়। তিনি আরো দাবি করেন, জৈবিক মাতৃত্ব নারীর অধিকারহীনতার মূল কারণ।

এড্রিন রিস র‍্যাডিকেল নারীবাদী হলেও জৈবিক মাতৃত্বের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি মনে করেন, প্রযুক্তির ব্যবহার সন্তান ধারণের কষ্ট থেকে মুক্তি দেবার জন্য নয়। নারীকে তার দৈহিক সুবিধা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং প্রযুক্তির সুবিধা নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নারীর প্রজননক্ষমতা এবং নারীর জৈবিক মাতৃত্ব নিয়ে র‍্যাডিকেল নারীবাদীরা প্রশ্ন তুলে প্রজননপ্রযুক্তিকে সম্ভাব্য সমাধানের উপায় হিসেবে দেখেছেন। এখন আমরা দেখব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে র‍্যাডিকেল নারীবাদীদের দেয়া এ সমাধানের প্রযোজ্যতা কতটুকু।

বাংলাদেশে নারীর অবস্থান এবং মর্যাদা কোনোটাই পুরুষের সমপর্যায়ের নয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে (সংবিধানে) নারীর প্রতি সমান অধিকারের কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নারীর স্থানকে রহস্যাবৃত করে। কেননা রাষ্ট্র একাধারে পারিবারিক আইনও বলবৎ রেখেছে, যেখানে নারীর অবস্থান পুরুষের অধীনে এবং এ আইনগুলো নামমাত্র নারী অধিকার সংরক্ষণ করে। পারিবারিক আইনে নারীর সম্পত্তির অধিকার খুব কম; মুসলিম পারিবারিক আইনে যা পুরুষের অর্ধেক, হিন্দু পারিবারিক আইনে নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা অতিমাত্রায় পুরুষতান্ত্রিক। এ কারণে অধিকাংশ নারী বাস্তব জীবনে রাষ্ট্র কর্তৃক দেয়া অধিকার; যেমন, শিক্ষার অধিকার, চিকিৎসার অধিকার ইত্যাদি খুব কম মাত্রায় ভোগ করতে পারে। হাতে গোনা কিছু নারী বাদে সামগ্রিক চিত্র মোটামুটিভাবে এরকমই।

নারীর যৌনতা এবং তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা রাজনীতির কারণে নারী প্রজনন অধিকার থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশে নারীর অবস্থান এখনো সেই পর্যায়ে যায় নি যে, এখানকার নারী র‍্যাডিকেল নারীবাদীদের দেয়া তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারবে। নারীর সামাজিকীকরণ নারীকে যেমন পুরুষতন্ত্রের বলয় থেকে বের হতে দেয় না, তেমনি তার অর্থনৈতিক দুর্বল অবস্থা তাকে নিজের আলাদা সত্তা সম্পর্কে ভাবতে নিরুৎসাহিত করে। ফলে সে বঞ্চিত হয় তার গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন অধিকার থেকে। যেখানে নারী তার মৌলিক মানবাধিকার থেকেই বঞ্চিত, সেখানে

র‍্যাডিকেল নারীবাদে তার অংশগ্রহণের চিন্তা বৃথা। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের প্রজননপ্রযুক্তির অন্য দিকগুলো নিয়েও ভাবতে হবে।

২.

নারীর প্রজনন অধিকার

নারীর প্রজনন অধিকার নারীর মানবাধিকার। নিজের সন্তান জন্মদানের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যেক নারীর প্রয়োজন ও অধিকার। প্রজনন অধিকার সব যুগলের জন্য প্রযোজ্য; যা নির্দ্বিধায় তাদের সন্তানসংখ্যা নির্ধারণ, সন্তান জন্মদানের মাঝে বিরতি, কখন সন্তান নেবে তা নির্ধারণে নারীর নিজের সিদ্ধান্তের ওপর গুরুত্ব দেয়। এটি প্রজননসংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে এবং বঞ্চনা, সহিংসতা ও জোরপূর্বক সন্তান উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করে।

প্রজননপ্রযুক্তি

প্রজননপ্রযুক্তি নারী বা পুরুষের প্রজননসংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত হয়, যা প্রজনন ভূমিকাকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা (contraceptive method) প্রজননপ্রযুক্তির অন্তর্গত; যেমন, জন্মনিয়ন্ত্রণকারী পিল, কনডম, বন্ধ্যাকরণ (sterilization), কপার-টি, ইত্যাদি। প্রজননপ্রযুক্তি নারীকে তার উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, আবার বাড়াতেও সাহায্য করতে পারে। বর্তমানে প্রজননপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার হলো মায়ের শরীরের বাইরে সন্তান জন্মদান, যাকে র‍্যাডিকেল নারীবাদীরা নারীমুক্তির পথ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

নারীর কর্তৃত্ব (Autonomy)

প্রজননপ্রযুক্তির প্রতি নারীর কর্তৃত্ব বলতে কোনোরকম বাইরের প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নারীর নিজের সিদ্ধান্তে, নিজের প্রয়োজনে প্রজননপ্রযুক্তির ব্যবহারকে বোঝানো হয়। কোনো বিষয়ে নারীর কর্তৃত্বকে আমরা অনুরূপভাবে বলতে পারি যে, নারীর কর্তৃত্ব হলো নারীর স্বাধীন সিদ্ধান্তগ্রহণ, সেসব বিষয়ে, যা দ্বারা নারী নিজে এবং তার পারিপার্শ্বিকতা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নারীর গর্ভাবস্থা নারীকে তার বহির্জগৎ থেকে বিচ্যুত করে। বাইরের জগতে উৎপাদন ভূমিকায় থাকা একজন নারী কখন সন্তান গ্রহণ করবেন, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য কী পদ্ধতি ব্যবহার করবেন, সন্তানসংখ্যা এবং তাদের মধ্যকার বিরতি কত হবে ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে অর্থাৎ তার পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যখন নারী নিজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য ভূমিকা নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হন, তখন তার নিজের কর্তৃত্ব বজায় আছে বলে ধরা যেতে পারে।

৩.

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে র‍্যাডিকেল নারীবাদীদের (শুলামিথ ফায়ারস্টোন, অ্যান অকলে) দেয়া জৈবিক মাতৃত্ব অস্বীকার করে প্রজননপ্রযুক্তি ব্যবহারে নারীর কর্তৃত্ব আনয়ন সুদূরপ্রসারী বিষয়। একটা জিনিস শুলামিথ ফায়ারস্টোন একেবারেই উপেক্ষা করে গেছেন, তা হলো, প্রজননপ্রযুক্তির ব্যয়বহুলতা। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল নারীর পক্ষে জৈবিক মাতৃত্বকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আবার পৃথিবীর প্রয়োজনে তাকে মানবসন্তান জন্ম দিতে হচ্ছেই। যেসব নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী তারাও খুব কোণঠাসা হয়ে না পড়লে জৈবিক মাতৃত্বকে অস্বীকার করতে চান না।

এক্ষেত্রে র‍্যাডিকেল নারীবাদী রিস যে সমাধানের কথা উল্লেখ করেছেন তা অবলম্বন করা যেতে পারে। তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে, জৈবিক মাতৃত্ব নারীর কোনো সীমাবদ্ধতা নয়, বরং এ শক্তি দিয়েই নারীকে এগিয়ে

যেতে হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা রিস-এর বক্তব্য সামনে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। সেক্ষেত্রে প্রজননপ্রযুক্তির ব্যবহার এমন হবে যেন নারীর নিজস্ব সিদ্ধান্তে নারী তা ব্যবহার করতে পারেন।

নারীর মাতৃত্বের কারণেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাকে গৃহবন্দি করে রেখেছে। এখন নারী যদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার নিজের কর্তৃত্ব, নিজের আমিত্বকে আবিষ্কার করতে চান, তাহলে উৎপাদনশীল কাজে তার অংশগ্রহণ আবশ্যক। নারী তার উর্বরতা গুণকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদনশীল কাজে যুক্ততা বাড়াতে পারেন। কখন সন্তান ধারণ করলে তার উৎপাদনশীল কাজের ব্যাঘাত হবে না বরং সন্তান ও তার নিজের জন্য সুবিধাজনক হবে তা নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োজন প্রজননপ্রযুক্তির ব্যবহার।

আমরা জানি, প্রজননস্বাস্থ্য ও প্রজননপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জানা নারীর অধিকার ও কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়। আমরা যখন বলছি, প্রজননপ্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজের উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ করে নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে নারীর নিজস্ব কর্তৃত্ব বজায় রাখা সম্ভব, সেখানেও কতগুলো প্রশ্ন থেকে যায়; যেমন, নারীর প্রজননপ্রযুক্তি (জন্মনিয়ন্ত্রণকারী পিল, বন্ধ্যাকরণ, কপার-টি, ক্যাপসুল, ইত্যাদি) সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার আছে কি না? আবার আধুনিক রাষ্ট্রগুলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেখানে সন্তানসংখ্যা নির্ধারণ করে দিচ্ছে, সেখানে প্রজননপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নারীর সন্তানসংখ্যা নির্ধারণে স্বাধীন মতামতের গুরুত্ব কতটুকু? আবার পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবখানেই যেখানে শক্তিশালী পুরুষতন্ত্র বিদ্যমান, সেখানে প্রজননপ্রযুক্তির ব্যবহারে নারী কর্তৃত্ব আনলেও তার বাস্তবিক প্রয়োগ কোন অবস্থানে?

প্রথমত, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণকারী প্রযুক্তির সঠিক তথ্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা কম। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এটি সাধারণত উন্নয়নশীল দেশের মতো মানব গবেষণাগার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জন্মনিয়ন্ত্রণকারী প্রযুক্তিগুলোর খোলা গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে এখানে বৈদেশিক সাহায্যের অংশ হয়ে বিভিন্ন জন্মনিয়ন্ত্রণকারী পিল, কনডম, ইত্যাদি আসে, যা অনেক সময় বিনে পয়সাতেও মেলে। এসব পণ্য যখন নারী ব্যবহার করেন, তখন তারা তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে না জেনেই করেন।

বলা হয়, জন্মনিয়ন্ত্রণকারী প্রযুক্তি নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করছে তাদের পছন্দ বাড়িয়ে, নিজের উর্বরতার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তাদের যৌনতা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করে, সর্বোপরি তাদের নিজের জীবনকে পালটে দিয়ে। [Contraception empowers women by maximizing their choices and enabling them to control their fertility, their sexuality, their health, and thus their lives (Fathalla, M. 1994)]

কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আমরা এটা কীভাবে বলতে পারি যে, জন্মনিয়ন্ত্রণকারী পণ্যগুলো নারীর কর্তৃত্ব আনছে? যাকে নারী কল্পনা করছেন তার কর্তৃত্ব অর্জনের উপায় হিসেবে, প্রকারান্তরে তা-ই তাদের টার্গেটে পরিণত করে দুর্বল করে ফেলছে। আরো ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ জন্মনিয়ন্ত্রণকারী পণ্য; যেমন, জন্মনিয়ন্ত্রণকারী পিল, কপার-টি, ক্যাপসুল, বন্ধ্যাকরণ, ইত্যাদির প্রধান অভীষ্ট নারীরা। তাহলে আমরা কি আবারো নারীর প্রতিই প্রজনন বিষয়ের সবটুকু বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাকে পুরুষতন্ত্রের বলয়ে আবদ্ধ করছি না?

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র যেখানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করছে, সেখানে প্রজননপ্রযুক্তির ব্যবহারে সন্তানসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারীর নিজের স্বাধীন মতামতের গুরুত্ব কতটুকু? প্রশ্নটি ভাববার মতো। আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যেখানে জনসংখ্যাকে দেখে নিজের স্বার্থ উদ্ধার (টেকসই উন্নয়নের নামে)-এর হাতিয়ার হিসেবে, সেখানে একজন নারীর সন্তানসংখ্যা নির্ধারণে নিজের মতামত নয়, বরং রাষ্ট্রীয় মতামতই বেশি প্রযোজ্য। এখানে নারী জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি ব্যবহার করে সন্তান কখন নেবেন তা ঠিক করতে পারেন এবং সন্তানদ্বয়ের মধ্যকার বিরতি ঠিক করতে পারেন, কিন্তু

সন্তানসংখ্যা নিজে নির্ধারণ করতে পারেন না। এটা কি নারীর প্রজনন অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা নয়? যদি প্রজনন অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহলে প্রজননপ্রযুক্তির ব্যবহারে কর্তৃত্ব অর্জনের কোনো মূল্য থাকে না।

তৃতীয়ত, শক্তিশালী পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারী কতটুকু কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারবে? দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা দেখি, সন্তান নেবার সময় এবং তাদের মধ্যকার বিরতি জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করবার সম্ভাবনা থাকলেও তৃতীয় ক্ষেত্রে তা নাকচ হয়ে যায়। কেননা সত্যিকার অর্থে পুরুষতন্ত্র নারীকে এখনো এতটাই কোণঠাসা অবস্থানে রেখেছে যে, নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী থাকলেও নিজের কর্তৃত্ব প্রকাশ বা চর্চা করতে পারছে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জৈবিক মাতৃত্ব অস্বীকার করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রজননপ্রযুক্তির দ্বারস্থ হয়ে সন্তান জন্মদানের বিষয়টিও অকল্পনীয়। এর পেছনে আর্থিক বিষয় ছাড়াও সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তন ও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে কৃত্রিম উপায়ে (টেস্টটিউব বেবি) সন্তান জন্মদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও নারীসমাজের কাছে এখনো এটি জনপ্রিয় হয় নি। কোনো নারী যদি প্রাকৃতিকভাবে সন্তান জন্মদানে একেবারেই ব্যর্থ হন, তাহলেই কেবল এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে বাধ্য হন।

৪.

তাহলে প্রশ্ন আসে, প্রজননপ্রযুক্তির ব্যবহার কি নারীর কর্তৃত্ব আনতে একেবারেই সাহায্য করবে না? অবশ্যই নারীর জীবনে প্রজননপ্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে এবং নারীর কর্তৃত্ব আনতে এর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তার আগে কতগুলো বিষয় নিশ্চিত করা প্রয়োজন :

১. পারিবারিক পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই নারীর সমান অধিকার ও সমান মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে;
২. জনসংখ্যা নীতিগুলো যথাসম্ভব নারীবান্ধব করে তুলতে হবে, তাতে নারীর মতামতের প্রতিফলন ঘটতে হবে;
৩. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ শিথিল করতে হবে;
৪. নারীর সব ধরনের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;
৫. প্রজননপ্রযুক্তি ও প্রজনন অধিকার সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে;
৬. নারীর উৎপাদনশীল ও পুনরুৎপাদনশীল কাজের সমমর্যাদা দিতে হবে; এবং সর্বোপরি
৭. জনমানসে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

আমার মনে হয়, এসব যথাযথভাবে নিশ্চিত করা গেলে প্রজননপ্রযুক্তির ব্যবহার নারীর কর্তৃত্ব আনতে ও তা বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

উপসংহার

আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুব সীমিত পরিসরেই প্রজননপ্রযুক্তির ব্যবহার নারীর কর্তৃত্ব আনতে সাহায্য করছে। বাংলাদেশ সরকার নারীর প্রতি বৈষম্যবিরোধী সিডও সনদ, মানবাধিকার সনদ ও জনসংখ্যা-বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আইসিপিডিতে স্বাক্ষর করেছে। তাই বলা যায়, নারীর মৌলিক মানবাধিকারের প্রশ্নে প্রজনন অধিকার সংরক্ষণে প্রজননপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব সরকারের। পারিবারিক পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই নারীর সমান অধিকার ও সমান মর্যাদা নিশ্চিত করা; জনসংখ্যা নীতিগুলো যথাসম্ভব নারীবান্ধব করা ও তাতে নারীর মতামতের প্রতিফলন ঘটানো; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ শিথিল করা এবং নারীর সব ধরনের মৌলিক অধিকার, প্রজননপ্রযুক্তি ও প্রজনন অধিকার সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণসহ নারীর উৎপাদনশীল ও

পুনরুৎপাদনশীল কাজের সমমর্যাদা ইত্যাদি নিশ্চিত করা গেলে নারীর নিজের প্রয়োজনে প্রজননপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত হবে। আর তখনই প্রজননপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতঅর্থে নারীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

আফিফা আফরিন সুইসকনট্যাক্ট-এর একজন কর্মকর্তা। afifa101@gmail.com

তথ্যসূত্র

- আরা, শ. ২০০৯. জেন্ডার ইস্যু, ঢাকা : জেনারেশন পিপিএ।
- গুহঠাকুরতা, ম. ২০০২. নারী ও রাষ্ট্র, ওহ. হাসানুজ্জামান, আ. ম. সম্পাদিত, বাংলাদেশের নারী : বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
- মান্নান, আ. এবং খানম, স. ২০০৬, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা : অবসর প্রকাশনা।
- হোসাইন, আ. ন. ২০০২, জেন্ডার মতাদর্শ ও রাজনৈতিক ডিসকোর্স : নারীবাদী চিন্তার আলোকে একটি বিশ্লেষণ, ওহ. হাসানুজ্জামান, আ. ম. সম্পাদিত, বাংলাদেশের নারী : বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
- Fathalla, M. F. 1994. Fertility Control Technology: A Women-Centered Approach to Research. In: Sen, G., Germain, A. and Chen, L. C. eds. 1994. Population Policies Reconsidered. New York: Harverd School of Public Health, pp. 223-234.
- Firestone, S. 1971. The dialectic of sex. New York: Bantam Books.
- Oakley, A. 1974. The sociology of housework. London: Robertson.